বাজেটে উপেক্ষিত নারী

জাতীয় বাজেটে মোট বরাদ্দের মাত্র ৩% নারীর উন্নয়নের জন্য রাখা। নারীর অর্থনৈতিক শক্তির স্বীকৃতিও নেই বাজেটে... লিখেছেন **সেরীন ফেরদৌস**

জাতীয় বাজেটে নারীর জন্য বরাদ্দ বা নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক সম্প্রতিকালের। নারীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় না আনা গেলে তাকে সামগ্রিক পশ্চাদপদতা থেকে মুক্ত করা যাবে না এই উপলব্ধি থেকেই বাজেটে নারীর বরাদ্দের বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। আর বাজেট হচ্ছে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক দলিল। তাই নারীর দাবি ফলপ্রসূভাবে বাস্তবায়নের বিষয়টিও বাজেটে সম্পৃক্তি হতে বাধ্য।

বাজেটে নারীর প্রসঙ্গ এলে প্রথমেই নজর যায় নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতি। এবারের বাজেটে নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দ বেড়েছে। ২০০১-০২ সালের বাজেটে এ মন্ত্রণালয়ের জন্য রাজস্ব ও উন্নয়ন ব্যয় মিলিয়ে বরাদ্দ ছিলো ৯০ কোটি টাকা। তার মধ্যে রাজস্ব ব্যয় ছিলো ২২ কোটি টাকা ও উন্নয়ন ব্যয় ছিলো ৬৮ কোটি টাকা। পরে সংশোধিত বাজেটে রাজস্ব ও উন্নয়ন ব্যয় ধরা হয়েছে যথাক্রমে ২৭ ও ৪৬ কোটি টাকা। এ বছর (২০০২-২০০৩) নারী শিশু মন্ত্রণালয়ের জন্য মোট বরাদ্দ ধরা হয়েছে ১২৩ কোটি ৮ লাখ টাকা (রাজস্ব ব্যয় ২৭ কোটি ও উন্নয়ন ব্যয় ৯৬ কোটি টাকা) গত বছরের মোট উন্নয়ন বরাদ্দ .২২% থেকে বেড়ে এবার তা দাঁড়িয়েছে .২৭%-এ।

কিন্তু নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দ বাড়ানো মানেই নারীর সার্বিক উন্নয়ন নয়। তাছাড়া মহিলা মন্ত্রণালয়ের কাজ শুধু নারীদের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন করাই নয়। এ মন্ত্রণালয়েরও নানা সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এ মন্ত্রণালয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের নারী উন্নয়ন বিষয়গুলো তাদারকি করা। কিন্তু অন্য মন্ত্রণালয়গুলোতে নারীর জন্য বরাদ্দ বা পরিকল্পনা সীমিত হলে মহিলা মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ বা মনিটরিংও সেখানে সীমিত হয়ে পড়তে বাধ্য। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দের দিকে দৃষ্টি দিলে বোঝা যায়, সেসব জায়গায় নারীকে উন্নয়নের দিক দিয়ে প্রান্তিক অবস্থানে রাখা হয়েছে। তাদেরকে এসব মন্ত্রণালয়ের আওতায় বেশিরভাগই দুস্থ ও বিত্তহীনদের প্রকল্পের মধ্যে রাখা হয়েছে এবং তারা ভিজিডি, ভিজিএফ এবং ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

> কিন্তু এই দলিলে অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে নারীর স্বীকৃতি নেই। নারীর মেধা-দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে সরাসরি অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নৈতিক বা অন্য কোনো ধরনের পদক্ষেপের ঘোষণাও নেই। ফলে নারীর ব্যক্তিশক্তি, যোগ্যতা, দক্ষতা এবং রাষ্ট্রীয় উন্নয়নে তার ভূমিকাকে খাটো করে দেখা হয়েছে। ব্যাপারটা এমন যে, নারী শুধু অনুদান বা সাহায্যই পাবে, জনশক্তিতে পরিণত হয়ে জাতিকে এগিয়ে নেয়ার বেলায় সে সক্ষম নয়

বর্তমান বাজেটে কিছু শুভ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। তার মধ্যে বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা অসহায় নারীদের দেয়া সরকারের ভাতা ১০০ টাকা থেকে ১২৫ টাকায় বাড়ানো, এসিডদগ্ধদের জন্য বরাদ্দ, কর্মজীবী নারীর জন্য হোস্টেল বরাদ্দ, দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রী উপবৃত্তি সম্প্রসারণ ও টিউশন ফি মওকুফ ইত্যাদি রয়েছে। সরকারের 'পলিসি লিডারশিপ অ্যান্ড এডভোকেসি ফর জেন্ডার ইকুয়্যালিটি' বা প্লাজ প্রকল্প একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এই প্রকল্প ও ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ফর জেন্ডার মেইনস্ট্রিমিং-এর জন্য সাড়ে ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

কিন্তু এই দলিলে অর্থনৈতিক শক্তি

হিসেবে নারীর স্বীকৃতি নেই। নারীর মেধা-দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে সরাসরি অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নৈতিক বা অন্য কোনো ধরনের পদক্ষেপের ঘোষণাও নেই। ফলে নারীর ব্যক্তিশক্তি, যোগ্যতা, দক্ষতা এবং রাষ্ট্রীয় উন্নয়নে তার ভূমিকাকে খাটো করে দেখা হয়েছে। ব্যাপারটা এমন যে, নারী শুধু অনুদান বা সাহায্যই পাবে, জনশক্তিতে পরিণত হয়ে জাতিকে এগিয়ে নেয়ার বেলায় সে সক্ষম নয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়কে হিসাবে রেখেই সম্প্রতি গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে, গত বছর জাতীয় বাজেটের মোট বরাদ্দের মাত্র ৩% শুধুমাত্র নারীর উন্নয়নের জন্য রাখা হয়েছে। অথচ নারী সমাজের অনেকদিন ধরেই দাবি ছিলো এই বরাদ্দ অন্তত ৭% করা হোক। বিশেষ করে এই বরাদ্দ বাড়ানো হোক কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে।

বাংলাদেশের নারীগোষ্ঠী ইতিমধ্যেই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের সম্ভাবনার পরিচয় দিয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস, শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাওয়া, শ্রম বাজারে অংশগ্রহণ, গার্মেন্টস শিল্পে অবদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাপকহারে নারীর অংশগ্রহণ জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ব্যাংকিং সেক্টরে বেশি সংখ্যায় নারীর অংশগ্রহণ যথষ্ট সুনাম কুড়াচ্ছে। গার্মেন্টস শিল্পে অসংখ্য নারীর ভূমিকা, কিংবা বেসরকারি সংস্থায় নারীর কাজ এবং ইদানীং শিক্ষার ফলাফল নারীর অবদান সংক্রান্ত ধারণা আমূল পাল্টে দিয়েছে। কিন্তু এই সম্ভাবনাময় জনগোষ্ঠীর একাংশ নয়, পুরো অংশকে কাজে লাগানো বা তাদের উন্নয়নের কোনো চিন্তা বা পরিকল্পনা বাজেট ভাবনার মধ্যে নেই।

গত কয়েক বছর ধরেই শ্রমবাজারে নারীরা বেশি সংখ্যায় প্রবেশ করলেও তা পুরুষের প্রবেশাধিকারের তুলনায় এখনও অনেক কম। এক জরিপে দেখা গেছে, ১০ বছরের বেশি বয়সের নারীদের মধ্যে ১৮.১ শতাংশ নারী বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজে নিয়োজিত আছেন যেখানে পুরুষের মধ্যে এই সংখ্যা ৭৭ শতাংশ। নারীদের বিভিন্ন পেশায় আসার ক্ষেত্রে গত কয়েক বছর যাবৎ এনজিওরা বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। এর মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ অন্যতম। যদিও ক্ষুদ্র ঋণ নারীকে খুব বেশি সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না, তারপরও নারীর স্বনির্ভরতা ও বাকস্বাধীনতায় নিঃসন্দেহে শক্তি দিয়েছে এই অর্থনৈতিক সুবিধাটুকু। পোশাক শিল্পের ব্যাপক প্রসার নারীর অবদান সম্পর্কে আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে। দেখা যায়, নারীরা ঝুঁকিপূর্ণ এবং কম মজুরির পেশাগুলোতেই আসলে বেশি আসছে। অথচ তাদের পরিবেশ ও

সম্পত্তিতে নারীর প্রবেশাধিকার এবং নিয়ন্ত্রণ খুবই সীমিত। অথচ কৃষি ঋণ, গৃহ ঋণ, শিল্প ঋণ ইত্যাদিতে অংশ নিতে গেলে দেখা যায় জামানত প্রদান জরুরি। দেখা গেছে, এদেশের আর্থ-সামাজিক প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারী-পুরুষ বৈষম্যের কারণে লিঙ্গ সম্পর্কিত মাপকাঠির বিচারে ১৭৪টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪০তম

রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এখনও তেমন কোনো সিস্টেম তৈরি হয়নি। তাদের প্রাপ্ত সুবিধা কাজে লাগাতে হলে নিদেনপক্ষে কিছু বিত্ত বা প্রশিক্ষণও দরকার। এগুলোর অভাবে খুব বেশি দিন নারীরা শ্রমবাজারে টিকে থাকতে পারে না এবং অতিদ্রুত তাকে শ্রম বাজার থেকে বিদায় নিতে হয়। তাই নারীদের জন্য কেবল কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাই শুধু নয়, কর্ম-সহায়ক সুবিধাগুলো থাকা দরকার।

সম্পত্তিতে নারীর প্রবেশাধিকার এবং নিয়ন্ত্রণ খুবই সীমিত। অথচ কৃষি ঋণ, গৃহ ঋণ, শিল্প ঋণ ইত্যাদিতে অংশ নিতে গেলে দেখা যায় জামানত প্রদান জরুরি। শিল্পে যে কোনো ধরনের লাভজনক বড় ব্যবসা বা বড় উদ্যোক্তা হিসেবে দাঁড়াতে গেলে তাদের জন্য দরকার যথাযথ প্রশিক্ষণ এবং বড় ঋণ। এ দুটি অতি জরুরি প্রয়োজনীয় উপাদান সক্ষম নারীদের সরবরাহ করার বিষয়টি বাজেটে বিবেচনা করা হয়নি। বাজেটে উদ্যোক্তা নারীকে স্বীকৃতি দিয়ে তাদের জন্য জামানতবিহীন ঋণ, উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে বিশেষ সুবিধা ইত্যাদি ঘোষণা করা যেতো। শিক্ষিত নারীরা এই সুবিধা গ্রহণ করে লাভজনক ব্যবসা আরম্ভ করতে পারতেন। তারা নিজেরাই হয়তো কৃষিভিত্তিক বা বড় শিল্প স্থাপন করতে সক্ষম হতেন যা অন্যান্য বিত্তহীন নারীদের কর্মসংস্থানে সহায়তা করতে পারতেন। মোট কথা নারীর ব্যক্তিশক্তিকে উৎপাদনমুখী করতে হলে তার দিকে সম্পদ প্রবাহিত করতে হবে। এ প্রসঙ্গে প্রতিবেশী দেশ ভারতের বাজেটের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়। ভারত সরকার বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা কর্মে নারীর অংশগ্রহণ উৎসাহিত করতে চলতি বছরের বাজেটে ১০০টি করে বৃত্তি দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে। গত বছর নিজের আয় থেকে কর প্রদানকারী নারীদের নির্দিষ্ট পরিমাণ কর পরিশোধের জন্য বিশেষ পুরস্কারের ঘোষণা দেয়া হয়েছিলো। এই ধরনের পদক্ষেপে নারী যে 'কেবলমাত্র করুণাভোগী নয়' তা স্বীকৃতির মাধ্যমে সম্মানজনক অবস্থান পায়।

বৃহত্তর নারী সমাজের ক্ষমতায়ন ও জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের ব্যাপারে অসংখ্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতাগুলোও বাজেটে আসেনি। দেখা গেছে, এদেশের আর্থ-সামাজিক প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারী-পুরুষ বৈষম্যের কারণে লিঙ্গ সম্পর্কিত মাপকাঠির বিচারে ১৭৪টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪০তম। (হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন সাউথ এশিয়া, ১৯৯৭)। এই বৈষম্য নারীকে পশ্চাদপদ করে রেখেছে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ব্যাহত করেছে। এই প্রবণতার উত্তরণ ঘটাতে হবে। তাই বাজেটে নারীর জন্য পরিবহন, ডে কেয়ার, আইটি সেক্টরে প্রশিক্ষণ ইত্যাদি জরুরি বিষয়কে বিবেচনায় আনতে হবে। গ্রামের নারীরা তাদের অধিকাংশ শ্রমঘন্টা ব্যয় করেন গৃহকর্মে। তাদের জন্য বিদ্যুৎ, গ্যাস ইত্যাদি সরবরাহ করা গেলে তারা অন্য উৎপাদনশীল কাজে সময় ব্যয় করতে পারতেন।

ড. প্রতিমা পাল মজুমদারের গবেষণায় দেখা গেছে, বাজেটে গত কয়েক বছর ধরেই নারীরা যেটুকু বরাদ্দ পাচ্ছেন, তা যে ধরনের প্রকল্পের জন্যই হোক না কেন, বছর শেষে প্রায় পুরো বরাদ্দই খরচ হচ্ছে। অথচ দেখা যায় প্রতিবছর উন্নয়ন প্রকল্পে বরাদ্দের একটি বিরাট অংশই অব্যবহৃত থেকে যাচ্ছে। যে ক্ষুদ্র অংশটুকু নারী বাজেট থেকে পাক না কেন, তা যদি খুব উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে ব্যবহার করা যায়, তাহলে সেই বরাদ্দই নারীকে আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।

ব্যাপক নারীরা বাজেট সম্পর্কে অজ্ঞ। নারীরা জানেনই না তাদের উন্নতির জন্য কি কি দরকার অথবা বাজেটে কিভাবে সম্পদের বন্টন হয়। সচেতনতা নিয়ে যেসব এনজিওরা কাজ করছেন তাদের কর্মসূচির মধ্যেও জাতীয় বাজেট নিয়ে কোনো আলোচনা থাকে না। ফলে এ বিষয়ক বরাদ্দ নিয়ে কোনো দাবিও মাঠ পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায়ে উঠে আসে না। আর সরকারের প্রতিনিধিরাও বাজেট প্রণয়নের আগে নারী নেতৃত্বের সঙ্গে এ নিয়ে কোনো আলোচনা করতে নারাজ থাকেন। নারী সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। অস্ট্রেলিয়াতে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিলো ১৯৮৪ সালে এবং একটি নারী সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন সম্ভব হয়েছিলো ১৯৯১ সালে। দক্ষিণ আফ্রিকাতেও সরকার এবং বেসরকারি সংগঠন মিলে মাত্র তিন/চার বছরের মধ্যেই এই প্রক্রিয়া শেষ করেছে।